কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
৪৮

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক- ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকারিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকতার অভাব মোকাবিলার জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালের শাসন ব্যবস্থার সমস্যাগুলো একটি সামগ্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীতা তুলে ধরেছে। বিশেষত নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যাতে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্ন্তভুক্তির ভিত্তিতে একটি জনমুখী শাসন ব্যবস্থার মডেল তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ গত ৮–৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল হলে 'সুশাসনের জন্য জনসম্পৃক্ত সংস্কার, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন সম্মেলন আয়োজনে সহযোগিতা করে।

স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বিতর্ককে প্রভাবিত করা এবং শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল এই সম্মেলন আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। নীতি প্রণয়ন ও সরকারি সেবা সরবরাহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ওপর সম্মেলনে আলোকপাত করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার মতো সরকারি সেবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে কীভাবে আরও কার্যকরভাবে পৌছানো যায়, তা নিয়ে একটি মডেল শাসন ব্যবস্থার কৌশল প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বিষয়ে একটি সংলাপের সুচনা করা।

জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন জোরদার

তৃতীয় কর্ম অধিবেশন সম্পর্কে

`জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন জোরদার' শিরোনামের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ শাহান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসের সিনিয়র ফেলো ড. ফস্টিনা পেরেরা এবং সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

মূল প্রবন্ধের বিষয় ও প্রেক্ষিত

ড. আসিফ শাহান "ব্রেকিং দ্য আয়রন ট্রায়াঙ্গল অব পলিসি মেকিং ঃ এমপাওয়ারিং মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন রিয়ালাইজিং রাইটস" শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি টাইটেলে ব্যবহৃত 'আয়রন ট্রায়াঙ্গল' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেন, নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া যখন বদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেখানে রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদ, আমলা এবং একই সাথে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী 'ইন্টারেস্ট গ্রুপ' এর কাছে নীতি আবদ্ধ থাকার পরিস্থিতি বুঝাতে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও একটি 'আয়রণ ট্রায়াঙ্গল' রয়েছে। এটি সমবাহু নয়, বিষমবাহু। বিষমবাহু এ কারণে বলছেন যে, নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আমলাতন্ত্র খুবই শক্তিশালী। রাজনীতিবিদদের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে

আমলাদের মতামতই বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন 'ইন্টারেস্ট গ্রুপ' পছন্দ করে। স্বাধীনভাবে কারও অংশগ্রহণের জায়গা খুবই সীমাবদ্ধ। এ ধরণের একটি নীতি প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ আছে কি-না, থাকলে কীভাবে আছে এবং নতুন একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের কথা বলা হচ্ছে, তাকে ব্যবহার করে নতুন কিছু করা যায় কি-না, তা নিয়ে তার প্রবন্ধ।

ড. আসিফ শাহান উল্লেখ করেন, "গত ৫ আগস্টের পর বারবার শুনছি, আমরা একটা নতুন সামাজিক চুক্তি চাই, আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক স্থিতি চাই এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চাই। এসব কথা আশার সঞ্চার করে নীতি প্রক্রিয়ায় হয়তো একটা পরিবর্তন আসবে। তার উপস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে সরকারের মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ যেসব নীতি তৈরি করে, সেগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ের নীতি প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আছে কি-না। নীতি বাস্তবায়নের সময় কোনো আপত্তি জানানো বা 'ফিডব্যাক' এর ব্যবস্থা আছে কি-না।

ড. আসিফ শাহান তার প্রবন্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কারা- তা নিয়ে একটি ধারণা দেন। তার মতে, মোটাদাগে এলএনওবিদের চারটি মাত্রায় দেখা যেতে পারে। একটা হচ্ছে স্থানিকভিত্তিক, অর্থাৎ যারা চর বা হাওড়ের মতো এলাকায় বাস করছেন, যারা ঠিকঠাক মতো সরকারি সেবা পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত- পরিচিতি-ভিত্তিক ভঙ্গুরতার কথা বলা হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা জেন্ডারভিত্তিক অবস্থার বিবেচনা করা হয়। ট্রান্সগ্রুপ এখানে আসতে পারে। তৃতীয়ত- জীবনচক্র ভিত্তিক ভঙ্গুরতা। তাদের মধ্যে বয়স্ক, প্রতিবন্ধীরা থাকতে পারেন। শেষত- আয়ভিত্তিক ভঙ্গুরতার কথা জানা যায়, যারা অতি দরিদ্র বা দারিদ্র্য সীমার নিচে আছেন। এরকম নয় যে, একটা গ্রুপের মধ্যে এক ধরণের ভঙ্গুরতা থাকে। চর বা হাওড় অঞ্চলের মধ্যেও কিন্তু জেন্ডার, জীবনচক্র বা আয়ভিত্তিক ভঙ্গুরতা থাকতে পারে।

ড. আসিফ শাহান উল্লেখ করেন, পাবলিক পলিসি ডিস্ট্রিবিউশন সব সময় 'উইনার' এবং 'লুজার' তৈরি করে। এটি শুধু একটি গ্রুপের কতখানি ক্ষমতা তার ওপর নির্ভর করে না, ওই গ্রুপটাকে সমাজের ডমিন্যান্ট গ্রুপ কী চোখে দেখছে- তার ওপর নির্ভর করে। সোসাইটির কাছে ওই গ্রুপের ইমেজ কেমন, তাও একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। যে গ্রুপের ক্ষমতা বেশি এবং ইমেজও ইতিবাচক তারা 'অ্যাডভ্যানটেজড' গ্রুপ। যে গ্রুপের ক্ষমতা বেশি, কিন্তু ইমেজ নেতিবাচক তাদেরকে 'কনটেন্ডার' গ্রুপে রাখা যেতে পারে। যাদের ক্ষমতা কম, কিন্তু ইমেজ ইতিবাচক তাদেরকে 'ডিপেনডেন্ট' গ্রুপে এবং যাদের ক্ষমতা কম কিন্তু ইমেজও নেতিবাচক তাদেরকে 'ডিভাইন' গ্রুপে রাখা যেতে পারে।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কোথায়

ড. আসিফ শাহান উল্লেখ করেন, গত ৫, ১০ বা ১৫ বছর ধরে দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। একটা হলো- কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা নাগরিক সমাজের সংগঠন, বিশেষজ্ঞ এবং থিংক ট্যাংকগুলোর সরকারের নীতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেক সময় অংশীজন আলোচনার মাধ্যমে তা হয়েছে। অনেক সময় তাদের পক্ষ থেকে সরকারকে জানানোর মাধ্যমে তা হয়েছে। ২০০৮-০৯ সালে তাদের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনে সই করেছে। আবার এর পরবর্তীতে ২০১৫ সালের পরে দেখা যাচ্ছে, এমন সংগঠনগুলোর কাজের পরিসরকে ইচ্ছাকৃতভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের পক্ষে তাদের কথা বলা বন্ধ করার একটা চেষ্টা হয়েছে। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর জায়গার সংকোচন দেখা গেছে।

ড. ফস্টিনা পেরেরা বলেন, নীতি নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতার অনেক উদহারণ রয়েছে। এর মধ্যে বৈষম্য বিরোধী আইনটা একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। আইনটি কোন নাগরিকের হাতে নেই। আইনটি যে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, তাকে 'নেতিবাচক সাফল্য' বলা যেতে পারে। বৈষম্য বিরোধী আইনের মূল সমস্যা ছিল, যার জন্য এই আইন, তার কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তি অনুপস্থিত। মাঝে মাঝে বলা হয়েছে, অংশীজন বা হকদারদের সাথে আলাপ হয়েছে। কিন্তু তারা কি আদতেই এখানে আছেন। প্রশ্ন হচ্ছে- যার জন্য করা তিনি ত্রিভুজের কোথায়। অসম বাহুর কোথাও লুকিয়ে আছেন নাকি তার কথা বলার ক্ষেত্র খুলে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি প্রশ্ন রাখেন, কারা তাহলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে? স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির আলোচনা যারা আয়োজন করছেন, উদাহরণস্বরূপ ইউএনও কি তার মতবিরোধী কথা আমলে নেন? একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা মেম্বার কি এমন কারও কথা শোনেন, যিনি তার কাজের সমালোচনা করেন?

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আশির দশকে এবং নব্বই দশকের শুরুতে নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না। খুব বিশিষ্টজনেরা ঘরের ভিতরে তাদের মতো করে করতেন। এমনও শোনা যেতো, বিদেশি দাতা সংস্থার পরামর্শকদের মত নিয়ে নীতি প্রণয়ন করা হতো। আগের চেয়ে উন্নতি হলেও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে এমনটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

তৌফিকুল ইসলাম খান উল্লেখ করেন, তিনি পুরো বিষয়টি চারটি স্তরে দেখেন। প্রথম বড় বিষয় হলো অংশগ্রহণ, যেখানে বড় চ্যালেঞ্জ প্রতিনিধিত্ব। কারা আলোচনায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন কিংবা সেখানে আসতে পারছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত। শুধু গত ১৫ বছরে নয়, নব্বই দশকের পরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমলাতান্ত্রিকভাবেই এ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। সাধারণত জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার কথা, সেভাবে হয় নি।

তার মতে, নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পছন্দসই বা পছন্দসই না হওয়ার একটা বিষয় আছে। চ্যালেঞ্জটা হলো- প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত কীভাবে করা হবে। কেননা প্রান্তিক মানুষের কোনো কাঠামোগত চেকলিস্ট নেই। নারীদের একটা অংশগ্রহণ থাকতে হবে-এই সমঝোতাটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ঠিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করা হয় নি। রাজনৈতিকভাবেও তাই হয়েছে। কাঠামোগতভাবে দুটি গোষ্ঠী সংগঠিত। একটি হলো বেসরকারি খাত। তাদের চেম্বার এবং অ্যাসোয়িশনের মাধ্যমে তারা সংগঠিত। তারা অনেক সময় ক্ষমতার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংগঠিত গোষ্ঠী হলো শ্রমিক শ্রেণী। তারা শ্রম ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করছে। নাগরিক সংগঠনগুলো এখনও প্ল্যাটফর্ম হিসেবে খুব শক্ত অবস্থানে যেতে পারেনি।

তৌফিকুল ইসলাম খান এর মতে, দ্বিতীয় বড় বিষয়টা হলো – কণ্ঠস্বর তুলে ধরা। কথা বলার সুযোগ কতটুকু এবং নাগরিকদের প্রস্তুতি নেওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা-তা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একটা জাতীয় নীতির বিষয়ে কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে হলে জানাশোনার সক্ষমতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিষয়টা হলো প্রতিফলন। যে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে কতটুকু নেওয়া হয়েছে, কতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে জানা যায় না। প্রতিফলন হলো কি হলো না, তা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না। আলোচনা একটা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই নীতি প্রণয়ন করা হয়। চতুর্থ বিষয় হলো জবাবদিহিতা। কেন মতামত নেওয়া হলো বা হলো না, তার কোনো জবাবদিহিতার জায়গা নেই। বড় সমস্যা হয়েছে পরবর্তীতে, যেহেতু গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা দুর্বল হয়ে যায়।

ড. আসিফ শাহান এর মতে, পাবলিক পলিসি বা জননীতির একটা মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদকে স্থানান্তর করা। যে গ্রুপ সরকারের কাছ থেকে তার দাবির জায়গাটা আদায় করতে পারবে, সম্পদ সংগ্রহের দিক থেকে তারা এগিয়ে থাকবে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রথমত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বা প্রাপ্তির জায়গায় একটা ঝামেলা আছে। তারা সব সময় একটা অসুবিধাগত অবস্থানে থাকেন। তাদের মোবিলাইজ করার ক্ষমতা কম। দাবি জানানোর সঠিক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিকল্প হিসেবে অনেক সময় তারা নাগরিক সমাজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যখন নাগরিক সমাজের সংগঠন নীতির জন্য 'পুশ' করতে পারে, তখন কাজ হয়। তবে নাগরিক সমাজের কাজের জায়গাটা সরকার সংকোচন করে দেয়, তখন দাবি জানানোর জায়গাটাও থাকে না।

তার মতে, এলএনওবি গ্রুপ আর্থিক সম্পদ মোবিলাইজেশনের ক্ষমতার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকে। তারা নীতি প্রক্রিয়ায় কতখানি অংশ নিতে পারবেন, তা নির্ভর করে ডমিন্যান্ট গ্রুপ তাদের কী চোখে দেখছে। সমাজের ডমিন্যান্ট গ্রুপ যখন কাউকে নেতিবাচকভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা করে, তখন ওই গ্রুপের পক্ষে কণ্ঠস্বর তুলে ধরা আরও বেশি কঠিন হয়ে যায়। এর একটা সমাধান হচ্ছে– যাদের ইমেজ ইতিবাচক তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। সরকার এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতা আসতে পারে, যাতে 'ডিপেন্ডেন্ট' গ্রুপ 'অ্যাডভ্যানটেজড' গ্রুপে আসতে পারে। যে গ্রুপের ইমেজ নেতিবাচক, তাদের জন্য 'কাউন্টার ন্যারেটিভ' তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। তখন তারা 'ডিপেন্ডেন্ট' গ্রুপে যাবেন। এক পর্যায়ে তারা সুবিধাজনক জায়গায় যাবেন।

ড. আসিফ শাহান মনে করেন, সরবরাহের দিক থেকে পুরো প্রক্রিয়াটাই রিঅ্যাকটিভ। এলএনওবির কাছে পৌছানোর কোনো প্রচেষ্টা সরকারের দিক থেকে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত– নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বর সংকুচিত হচ্ছে। যেমন লোকের কথা শুনতে পছন্দ, সেই ধরণের লোক অংশীজন সংলাপে নিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ– পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে ৬৪টি সংগঠনের প্রস্তাব ছিল, ১৮ থেকে ২৩ হাজার হোক। সরকার তার পছন্দের ৪টি গ্রুপের

সঙ্গে বসে যা ১২ হাজারে নির্ধারণ করে ফেলে। ফলে পছন্দমত লোকজন নিয়ে অংশীজন সংলাপ হয়েছে বলে সরকার এক ধরণের 'ভ্রম' তৈরি করে। সরকারি নীতির খসড়ার ওপর অনলাইনে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া মানুষের বেশরভাগই ডিজিটাল অনগ্রসরতার কারণে সেখানে তাদের অভিগম্যতা নেই।

তার প্রশ্ন, নাগরিক সংগঠনগুলো কতখানি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে? অনেক সময় তাদের কোয়ালিশনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকে না। অনেক সময় এলিটদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হয়ে যায়। স্থানীয় পর্যায়ের এলএনওবি গ্রুপগুলো নীতি প্রক্রিয়ায় ঢুকতে পারে না। এছাড়া কোয়ালিশনের ক্ষেত্রে 'বয়ান' তৈরির ক্ষেত্রেও বড় ধরণের সমস্যা রয়েছে।

সুপারিশ

ড. আসিফ শাহান মনে করেন- আমলাতান্ত্রিক ভূমিকাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষের মতামত তুলে ধরার আমলাতন্ত্র দরকার। তা না হলে বিশেষ ট্রায়াঙ্গল থেকে নাগরিকের কণ্ঠস্বর নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে উচ্চ কক্ষের কথা বলা হচ্ছে, সেই উচ্চ কক্ষে এলএনওবি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। নীতি সংশোধন কিংবা অংশীজন সংলাপের গুণগত উন্নতি হলেও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে যদি এগুলো না থাকে, তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নীতি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার অন্য কৌশল তৈরি হবে।

তার মতে, চাহিদার দিক থেকে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো– সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এলএনওবি গ্রুপগুলো যাতে মোবিলাইজ করতে পারে। রিসোর্চ মোবিলাইজেশনটা খুব দরকার। এছাড়া নাগরিক সমাজের কোয়ালিশনে যাতে এলএনওবির অংশগ্রহণ থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বাড়াতে হলে একদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে, অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ থাকতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজন নাগরিক সংগঠনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং কোয়ালিশনে অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। যদি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে এলএনওবির ভূমিকা সরকারি নীতি প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে না।

ড. ফস্টিনা পেরেরা এর মতে, ভালো নীতির ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির কথা সবাই বলছেন। কিন্তু এর সঙ্গে দেখতে হবে, কে বাদ পড়ে আছে। কে কাকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য করছে। কেন এক গোষ্ঠী এগিয়ে যাচ্ছে, আরেক গোষ্ঠী পিছিয়ে পড়ছে। অন্তর্ভুক্তির মধ্যে মাথায় রাখতে হবে ইন্টারসেকশনালিটি বা বহুরূপীতা। কারণ সকল পিছিয়ে পড়া মানুষ সমজাতীয় নন। যিনি একজন নারী তিনি কিন্তু বিবাহিত হতে পারেন, নিঃসন্তান হতে পারেন, তিনি চরাঞ্চলের মানুষ হতে পারেন কিংবা আরও নানা পরিচয় থাকতে পারে। নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান হারিয়ে যায়। ফলে ত্রুটিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয়। অতএব অন্তর্ভুক্তি এবং বহুরূপীতা একত্রিতভাবে আসতে হবে।

তিনি মনে করেন, নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষ কোথায় অবস্থান করছেন- তা দেখতে হবে। তার পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব কী, তিনি যেখানে বিচরণ করেন অর্থাৎ যেখানে সিদ্ধান্ত নেন কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে ছিটকে পড়েন, সেখানে তার অবস্থান এবং রাষ্ট্রে তার অবস্থান দেখতে হবে। একই সাথে আরও তিনটি জায়গা আছে, যেগুলোর ওপর নির্ভর করে তিনি দাবিটা ঠিকমতো রাখতে পারছেন কি-না। প্রথমত- তিনি সম্পদের কাছাকাছি যেতে পারছেন কিনা। দ্বিতীয় বিষয় হলো সিদ্ধান্ত। যার নামে নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তিনি সম্মতি দিয়েছেন কিনা। এবং কোনোভাবে তার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে কিনা।

তার মতে, সবকিছুর সাথে একটা অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে। দুটো জিনিসের সমন্বয় থাকতে হবে। কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচের সঙ্গে অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচ একত্রিতভাবে না নিলে 'টপ ডাউন' হয়ে যায়। তার ক্ষমতার অবমূল্যায়ন করা হয়। আর অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তার এজেন্সি প্রতিফলিত করতে পারি।

তৌফিকুল ইসলাম খান চারটি টুলের সুপারিশ করেন। একটা হলো- নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আরও বেশি সংগঠিত কৌশল থাকা উচিত। বহুমত থাকতে পারে, কিন্তু এফবিসিসিআইর মতো সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে

একতাবদ্ধ থাকলে প্রতিনিধিত্বের জায়গাটি সহজ হবে। আইন বা নীতি করার সময় কি কি পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, কি কি নেওয়া হয়নি- তা উপস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত- সরকারের পক্ষ থেকে ডকুমেন্টেশন এবং জবাবদিহিতার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। চতুর্থ বিষয় হলো- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

মিডিয়ার সক্রিয় ভূমিকা দরকার। উন্নয়ন সহযোগীদেরও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নীতি প্রণয়নে জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলো কিনা- তাদের পর্যবেক্ষণে থাকতে পারে।

ড. আসিফ শাহান এর উপস্থাপনায় আরও বলা হয়, সরকারের রুলস অব বিজনেসের ৩১-এ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ধরণের নিয়ম বা নীতি প্রণয়নের তিন সপ্তাহ আগে ওয়েবসাইটে তার খসড়া প্রকাশ করবে। যারা এটি দেখবেন, সে বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। এছাড়া সেক্রেটারিয়েট ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ২০১৫ সালে প্রণীত অভিযোগ নিস্পত্তির একটি নীতি রয়েছে। নীতি অনুযায়ী অভিযোগ নিস্পত্তিকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা। মন্ত্রি পরিষদে অভিযোগ নিস্পত্তি সেল তৈরির কথা রয়েছে।

চাহিদার দিক থেকে বলা যায়, এলএনওবি গ্রুপগুলো তাদের নিজস্ব চ্যানেল ব্যবহার করে ফিডব্যাক দিতে পারেন। নাগরিক সংগঠনগুলো এলএনওবির কণ্ঠস্বর প্রতিফলনের চেষ্টা করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সিএসও গুলো এককভাবে কাজ করে না, তারা একটি ‘কোয়ালিশন’ করেন। এর মাধ্যমে তারা এলএনওবি গ্রুপের অধিকার তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তারা প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে একটা নেগোসিয়েশন কৌশলে যান।

উম্মুক্ত বক্তব্য

উম্মুক্ত বক্তব্যের শুরুতে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, নারী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠ কীভাবে আমরা শুনতে পাবো সেই আলোচনা বিশেষজ্ঞরা করলেন। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সবাইকে প্রশ্ন এবং মতামত উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সম্মেলনে নারীদের কম উপস্থিতিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘একইভাবে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ কম। আপনারা আওয়াজ তোলেন। সুযোগ যদি তৈরি করা হয়, তাহলে সেটা নিতে হয়।’

সেন্টার ফর ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কর্মকর্তা আনিকা রহমান লিপি বলেন, পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রতিবন্ধীরা রয়েছেন। তারাই পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বেশি পিছিয়ে পড়া। এই মানুষগুলোকে সামাজিকভাবে একত্রিত করা খুব কঠিন। তাদের একত্রিত করতে রাষ্ট্র এবং নাগরিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগ থাকা উচিত।

অস্তিত্ব বাংলাদেশের কর্মী ইরা বলেন, নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি প্রান্তিক কমিউনিটির প্রতিনিধি থাকলে তারা তাদের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারবেন।

হেলভেটাস বাংলাদেশের কর্মী শাহরিয়ার বলেন, আরপিওতে প্রান্তিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলেছে। সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১৮ শতাংশ পর্যন্ত যেতে পেরেছে। শুধু নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রেখে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বাজেট যাতে জেন্ডার এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি সহনশীল হয়, তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে।

সাতক্ষীরার সুন্দরবন উপকূল থেকে আসা বেসরকারি সংগঠনের কর্মী প্রতিমা রানী মিস্ত্রি বলেন, তাদের এলাকার ছোট ছোট সংগঠন এনজিও ব্যুরোর আওতায় না থাকায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। এ ধরণের সংগঠনের কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া দরকার।

সাতক্ষীরা থেকে আসা আরেক ব্যক্তি শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, যখন তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। ওই এলাকা এক ফসলের ওপর নির্ভরশীল। চাষীর হাতে বীজ না থাকলে সমস্যা হয়। কৃষকদের জন্য পেনশন চালুর দাবি জানান তিনি।

আয়না আক্তার সুচনা নামে একজন অংশগ্রহণকারী সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানে এনজিওদের অবদান সম্পর্কে জানতে চান। এনজিওদের তহবিল গুলো ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কি না- তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন বিভিন্ন উপকূল এবং

পাহাড়ি এলাকায় এখনও মানুষ চরম দুর্দশাগ্রস্থ। এখনও একটু বিশুদ্ধ পানির জন্য অনেক এলাকার নারীদের ভোরে উঠে অনেক দুরে যেতে হয়।

নওগা থেকে আসা আদিবাসী নারী সাগরিকা বিশ্বাস বলেন, তারা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নন, আদিবাসী পরিচয়েই থাকতে চান। আদিবাসী মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না। যারা আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করতে চান, তাদের কাছে তিনি অনুরোধ করেন, তারা যাতে আদিবাসীদের মুখেই সমস্যার কথা শোনেন।

একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, গৃহকর্মীদের ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয় না। গৃহকর্মীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার কোনো মাধ্যম আছে কিনা এবং তাদের অধিকার রক্ষার কোনো আইন-কানুন বা নীতি আছে কিনা- তিনি জানতে চান।

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী বাপ্পী বলেন, মূল প্রবন্ধে নাগরিক সংগঠন এবং অধিকারভিত্তিক সংগঠনকে পিছিয়ে পড়া মানুষের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি জানতে চান, এক্ষেত্রে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোকে (সিবিও) কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা। তিনি আরও জানতে চান, ১১ টি সংস্কার কমিশন হয়েছে, কিন্তু এনজিও বা উন্নয়ন খাতের জন্য কোনো কমিশন হয়েছে কিনা এবং না হলে গঠনের সুযোগ রয়েছে কি না। যেসব সিবিও ট্রান্সজেন্ডারদের মতো বিভিন্ন স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে কাজ করে, তাদের নিবন্ধন সহজ করার দাবি জানান তিনি।

এস এম সৈকত নামে একজন অংশগ্রহণকারী এনজিও খাত সরকারি দপ্তরে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগিতার মুখে পড়ে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ফাইল না নড়ার সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন এখনও হয়নি। ডেভেলপমেন্ট খাত নিজেরাই পিছিয়ে আছে। তারা তাদের অধিকার নিয়ে অনেক সময় কথা বলে না। তার মতে, যুব সম্প্রদায়কে অগ্রণী, সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হলেও এরাই সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। শুধুমাত্র বলা হয়, ‘ আপনারা আগামী দিনের ভবিষ্যত। কিন্তু আগামী দিন আর আসে না।’ তিনি মনে করেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রীড়ার দিকে বেশি মনোযোগী। কারণ সেখানে টাকা আছে, সেলিব্রেটি আছে। তিনি ক্রীড়া বাদ দিয়ে যুবদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয়ের দাবি জানান।

একজন অংশগ্রহণকারী জানান, তারা একটি বড় এনজিওর সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। তাদের বিলের ওপর ২৫ শতাংশ ভ্যাট-ট্যাক্স কেটে নেওয়া হয়। দেড় বছর ধরে এনজিও ব্যুরো, গোয়েন্দা সংস্থা, ডিসি অফিস থেকে বিভিন্ন অনুমোদন তারা নিয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বলা হয়েছে, নতুন করে আবার তদন্ত হবে। এখনও সব জায়গার অনুমোদন না থাকায় তাদের তহবিল পেতে সমস্যা হচ্ছে।

হ্যাবিটাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনালের একজন কর্মী বলেন, ‘পলিটিক্যাল উইল’ বা রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা সব সময় বলা হয়। ‘পলিটিক্যাল উইল’ নয়, আসলে পলিটিক্যাল ট্রান্সফরমেশন কবে হবে তিনি জানতে চান। তিনি শহর এলাকায় যারা অনানুষ্ঠানিক বসতির মধ্যে আছেন, তাদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহবান জানান।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর কর্মী মনীষা বলেন, আমাদের দেশে ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীর সুরক্ষায় মেকানিজম নেই। এ কারণে অনেক ভুক্তভোগী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। তারা সহায়তার জন্য কোনো সংগঠনের কাছে আসতে ভয় পান।

সম্ভব ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি শিশির বিন্দু বিশ্বাস বলেন, অনেক আইন আছে যেগুলো ব্রিটিশ আমলে প্রণীত অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আইন। এসব আইন কবে আমাদের মতো হবে – তিনি জানতে চান। তিনি আইনের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির সুরক্ষার দাবি করেন।

রাগিব আরাফাত জানতে চান, জাতীয় সংসদে কেন প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধীদের নেই। সংসদের সংরক্ষিত আসনে কেন তাদের স্থান নেই। তিনি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান কম কেন- তা জানতে চান। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের দেওয়া ৭৫০ টাকা ভাতায় তাদের চলে কিনা- তিনি জানতে চান।

অস্তিত্ব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুব মুগ্ধ বলেন, বাংলাদেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত তার হিসাব নেই। গত জনশুমারিতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১০ হাজারের মতো। তিনি মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি। রাজনৈতিক কারণে কিংবা পিছিয়ে রাখতে চাওয়ার মানসিকতার কারণে সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। তিনি দাবি করেন, যাদেরকে পিছিয়ে পড়া বলা হয়, তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর আলাদা আলাদা জনসংখ্যার হিসাব করার উদ্যোগ নিতে হবে।

নারী পক্ষের প্রতিনিধি ফেরদৌসি বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০ নামে একটি আইন আছে। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা যে একটি অপরাধ তা এখনও মনে করা হয় না। এই আইনে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য যেসব বিধান আছে, তা নারীবান্ধব নয়। নারী পরিবারে থেকেই সুরক্ষার আবেদন করতে গেলে সমস্যায় পড়ছেন। তাকে পরিবার থেকে বের হয়ে যেতে হচ্ছে। এছাড়া ২০০৯ সালে প্রণীত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আইন হয়নি। তিনি মনে করেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সব বিভাগে একই রকম বরাদ্দ দিলে হবে না। ভাষাগত, জাতিগত বা লিঙ্গ বৈচিত্র্যগত বা যত ধরণের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়, তাদের ভাষা, রীতি, ধর্মচর্চা ইত্যাদি বিষয় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান তিনি।

উম্মুক্ত বক্তব্যের ওপর আলোচকদের প্রতিক্রিয়া

ঔপনিবেশিক আইনের বিষয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আইনের কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আবার কোনো আইন কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন আইনের তুলনায় সুবিধা দিচ্ছে। সুতরাং সব ঔপনিবেশিক আইন একবারে বাদ দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন না।

ড. ফস্টিনা পেরেরা বলেন, ঔপনিবেশিক আইন সংস্কারের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। ঔপনিবেশিক আইন মানেই যে নেতিবাচক, তা নয়। সংস্কারের নামে যা যা হচ্ছে, সেগুলো আসলেই দিন শেষে অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করছে কি না, তা দেখতে হবে। এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী আইন সুরক্ষা দিচ্ছে না। যেতে হচ্ছে ব্রিটিশ আমলের আইনে। বিশেষ করে পারিবারিক ক্ষেত্রে, যেখানে ধর্মীয় আইনের প্রভাব রয়েছে। অন্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাত হোক কিংবা যে কোনো খাত হোক, নারীদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা গেলে, তাদের কণ্ঠ উঠে আসবে। অনানুষ্ঠানিক খাত চিহ্নিত করতে পারলে সেখান থেকে একটি 'ক্রিটিক্যাল মাস' দাঁড় করানো যাবে।

সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে এনজিওদের জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে ড. আসিফ শাহান বলেন, গণহারে কোনো সিএসও বা এনজিও কিছু করেনি- এরকম নয়। অনেকে করেছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে পয়েন্ট উত্থাপন করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, এনজিওদের এ বিষয়ে একটি আত্ম উপলব্ধি দরকার। মনে রাখতে হবে, যে আন্দোলনটা হয়েছে, সেটি শেষ নয়।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা বনাম রাজনৈতিক রূপান্তর সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ড. আসিফ শাহান বলেন, 'আমি যদি এই ভরসায় কোনো প্রস্তাব করি যে, সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা হলে কাজটা হবে, তাহলে তা কখনই হবে না। এমন একটা মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যাতে রাজনীতিবিদরা নিজের স্বার্থের বাইরে যেয়ে কাজ করতে বাধ্য হবে। আমি যদি চাপ প্রয়োগ করতে পারি অর্থাৎ ঘটনাটা যদি এরকম হয়, এই কাজটা করলে তার নির্বাচনে প্রভাব পড়বে- তাহলে তিনি জনগণের উপকারের জন্য নীতি গ্রহণ করবেন। ভাতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোবিলাইজেশন। এক্ষেত্রেও সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে সাড়া পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হলো- মোবিলাইজেশনের জায়গায় সমস্যাগুলো কতখানি কাটানো যাবে। ফলে রাজনৈতিক ইচ্ছা নয়, জনগণের মোবিলাইজেশন এ সমস্যার সমাধানে সহায়ক।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, যুব সম্প্রদায় এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর নীতি প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ কম। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য উঠে আসার কথা। কিন্তু যেহেতু গণতন্ত্র দুর্বল অবস্থায় আছে, সেহেতু নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগাযোগ ও একাত্মতা বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র স্বার্থের ভিতর নিজের জায়গাটা তুলে ধরার মতো জায়গায় নাগরিকদের থাকলে হবে না। বড় সংগঠনগুলোর দায়িত্ব রয়েছে নিচের দিকে

যাওয়া। আর সিবিও কিংবা যুব আন্দোলনের সঙ্গে যারা আছেন, তাদের দায়িত্ব জায়গা করে নেওয়া। বড় সংগঠনের কাছে এসে তাদেরকে একাত্মতার কথা বলতে হবে।

সমাপনী বক্তব্য

অধিবেশেনর সমাপনী বক্তব্যে অধিবেশনের সভাপতি ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, এটি ঠিক যে, সবাই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এর জন্য আত্ম সমালোচনা বেশি হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, সম্প্রতি যেসব সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে এমনও কমিশন রয়েছে, যার মধ্যে একজন নারী প্রতিনিধিও নেই। বিশেষ করে জুডিশিয়াল রিফর্ম কমিশনের কথা উল্লেখ করেন। অন্য সংস্কার কমিশনে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও হয় নি। এই প্রশ্নগুলো এখনই তুলতে হবে। যারা যুব জনগোষ্ঠী, তারা সংগঠিত হয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। রাজনৈতিক ফোর্স না হলেও তারাই মাঠে ময়দানে নামার কারণে তো একটা পরিবর্তন এসেছে।

তিনি প্রশ্ন রাখেন, যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তারা কি অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবছেন? সংস্কার কমিটির শুধু রিপোর্ট লিখলে হবে না, সংস্কার তো মানুষ কিছু দেখতে চায়। তিনি বলেন, 'আমরা অনেক প্রতিবেদন পাবো। তারপর প্রতিবেদনগুলো নিয়ে অনেক সেমিনার হতে থাকবে। তারপর আমরা হয়তো নির্বাচনোত্তর অবস্থায় আগের মতো একটি পরিস্থিতিতে ফেরত যাবো। আমরা যদি সংস্কার চাই, তাহলে কীভাবে তা করতে পারি, তা নিয়ে ভাবতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আত্ম উপলব্ধি এবং আত্ম সমালোচনা শুধু এনজিওদের জন্য নয়, সকলকেই ভাবতে হবে, আমরা অন্তর্ভুক্তির জন্য বা বৈষম্য নিরসনের কথা বললাম এতদিন, কিন্তু বৈষম্য নিরসনের জন্য এই মুহুর্তে কি করছি? তার ভাষায় ''আমরা নিজেদের কথা সব সময় বলি। আমার কথা বলি। আমি একজন মধ্যবিত্ত মুসলিম নারী। বয়স পঞ্চাশের উপরে। এভাবেই যাতে আমার পরিচিতি না হয়। আমি হয়তো আমার বিষয় নিয়ে চিন্তিত আছি। আমার কি হবে? আমার প্রতিনিধিত্ব কোথায় হবে? কিন্তু আরেকজনের বিষয়ে যখন কিছু ঘটে যায় তখন অতটা সোচ্চার হচ্ছি না। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির জন্য সবাইকে অন্যের কথা বলতে হবে।''

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ''অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলো গত ১৫ বছরে ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। বিশেষ করে গত দুই তিন বছরে খুবই কোনঠাসা অবস্থায় ছিল। এই মুহুর্তে আমরা অধিকার নিয়ে কী খুব কথা বলছি? আমরা হয়তো নিজেদের অধিকারের কথা বলছি। যারা আন্দোলনকারী ছিলেন, আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন– তারা হয়তো নিজেদের অধিকারের পক্ষে বলছেন। কিন্তু অন্যদের কথাও ভাবতে হবে। আপনার বিপক্ষে যে কিংবা যে আপনার শত্রু. তার কথাও ভাবতে হবে। যদি না ভাবেন, তাহলে আপনি অধিকারের কথা বলছেন না, নিজের কথা বলছেন। অধিকারের কথা বলতে হলে যাকে আমি অপছন্দ করি, যার কথা শুনতে চাই না, তার ব্যাপারেও আমাকে উদার হতে হবে। তা না হলে আইনে পরিচিত অধিকার হলো না। আমরা যদি অন্তর্ভুক্তির কথা বলতে চাই, তাহলে বুঝতে হবে কোন সময়ে কে পেছনে পড়েছে।''

ব্যারিস্টার সারা হোসেন আরও বলেন ''আমরা যদি বলি, বাংলাদেশে এখন সবকিছু ঠিক আছে, আমরা সংস্কার করছি। আমি এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি। আমরা এখনও অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। একটা ক্রান্তিকালীন অবস্থায় সমস্যা থাকার কথা। কিন্তু আমরা যদি সমস্যাগুলো অন্তত: স্বীকার করি, তা হলে সমাধান করতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি বলি, আমরা একটা জঘন্য পরিস্থিতি থেকে সরে এসেছি, এখন যেখানে আছি, মোটামুটি ঠিক এবং ঠিক দিকে যাচ্ছি, তাহলে মনে হয় আমরা সমস্যার মধ্যে থেকে যাবো।''

সবশেষে তিনি বলেন ''আমি আশাবাদী হতে চাই। সবার প্রতি আহ্বান, কথা আরও বলতে হবে। সংগঠিত হতে হবে। একসাথে কাজ করতে হবে। যে কথা গুলো বলা কঠিন, যা বললে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সমস্যা হতে পারে, সেগুলো একটু বেশি করে বলা উচিত।''

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

ব্যারিস্টার সারা হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রবন্ধ উপস্থাপক

ড. আসিফ এম. শাহান
অধ্যাপক
উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচক

ড. ফস্টিনা পেরেরা
সিনিয়র ফেলো
সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: জনাব জাকির হোসেন, সহযোগী সম্পাদক, সমকাল।

আয়োজনে	সমর্থনে
Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ	Supported by Switzerland; UNDP

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net